**জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের**

**জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষ্যে বিশেষ নিবন্ধ**

**আওয়ামী লীগের জন্ম অনিবার্য ছিল**

প্রফেসর আবদুল মান্নান

আজ দেশের বৃহত্তম রাজনৈতিক দল বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের ৭১তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী। এই দিনে স্মরণ করছি প্রতিষ্ঠাতাদের অন্যতম জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানসহ অন্যদের, যাঁদের অসাধারণ দূরদর্শিতার ফলে এই দিনে ১৯৪৯ সালে ঢাকার রোজ গার্ডেনে দেশ ভাগের পর প্রথম রাজনৈতিক দল পূর্ব পাকিস্তান মুসলিম আওয়ামী লীগ, পরে পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগ এবং সব শেষে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের জন্ম হয়েছিল। আর আওয়ামী লীগ হচ্ছে এই উপমহাদেশের একমাত্র রাজনৈতিক দল, যেটির নেতৃত্বে একটি রক্তাক্ত মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে বাঙালিদের একটি স্বাধীন রাষ্ট্রের জন্ম হয়েছিল। এই স্বাধীনতার জন্য যাঁরা রক্ত দিয়েছেন সেই ৩০ লাখ শহীদের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা জানাচ্ছি।

দেশের একটি কঠিন সময়ের মধ্যে এই বছর ঐতিহাসিক দলটি তার প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী পালন করছে। হয়তো চিরাচরিত কোনো অনুষ্ঠান হবে না। সাধারণত এদিন প্রধানমন্ত্রী ও বঙ্গবন্ধুকন্যা শেখ হাসিনা দলের নেতাদের নিয়ে ধানমণ্ডি ৩২ নম্বরের বাড়িতে গিয়ে বঙ্গবন্ধুর প্রতিকৃতিতে সম্মান জানান। এবার হয়ত হবে না কোনো সভা-সমাবেশ। হতে পারে তিনি কিছু কাজ ভিডিওর মাধ্যমে করবেন। এমন কঠিন সময় শুধু বাংলাদেশেই নয়, বিশ্বে এর আগে কখনো আসেনি। আওয়ামী লীগের প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী শুধু মুক্তিযুদ্ধের সময় পালন করা হয়নি, কারণ তখন তা করার পরিবেশ ছিল না। বঙ্গবন্ধুকে সপরিবারে হত্যা করে বিএনপির প্রতিষ্ঠাতা জিয়া যখন আওয়ামী লীগের নাম নেওয়াকে অলিখিতভাবে নিষিদ্ধ করেছিলেন, তখনো দলের কিছু নিবেদিত প্রাণ নেতা ও কর্মী দিনটিকে ঘরোয়াভাবে পালন করেছেন।

আওয়ামী লীগ একবারেই এ দেশেই শুধু নয়, সারা ভারতবর্ষে একমাত্র জাতীয় দল, যার জন্ম এই মাটিতেই এবং তার একটি রাজনৈতিক উদ্দেশ্য ছিল। ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস গঠিত হয় এক ইংরেজ বেসামরিক আমলা অ্যালেন অক্টোবিয়াস হিউম দ্বারা ১৮৮৫ সালে। উদ্দেশ্য ভারতীয়দের সঙ্গে শাসক গোষ্ঠীর সম্পর্কোন্নয়ন। ১৯০৬ সালে ঢাকার নবাব আর বনেদি বিত্তশালীরা গঠন করেন মুসলিম লীগ তাঁদের ব্যক্তি ও গোষ্ঠীগত স্বার্থ রক্ষা করার জন্য। রাশিয়ার বলসেভিক বিপ্লবের পর ভারতে গঠিত হয় কমিউনিস্ট পার্টি ১৯২০ (মতান্তরে ১৯২৫ সালে) সালে মার্ক্সবাদ-লেনিনবাদের চিন্তধারার মতবাদ প্রতিষ্ঠা করার জন্য। ১৭৫৭ সালে পলাশীর যুদ্ধের পর ইস্ট ইন্ডিয়া কম্পানি ভারত দখলপ্রক্রিয়া শুরু করে। পরবর্তী ১০০ বছরে তারা নানা ছলচাতুরি ও বিশ্বাসঘাতকতা করে বস্তুতপক্ষে সারা ভারতবর্ষ দখল করে নেয়। ১৮৫৭ সালে ভারতের প্রথম স্বাধীনতাযুদ্ধের পর (ইংরেজ ঐতিহাসিকরা বলেন সিপাহি বিদ্রোহ) ভারতের শাসনভার কম্পানি থেকে ব্রিটিশ রাজপরিবারের কাছে চলে যায়। ১৮৫৭ সালের পর ইংরেজরা বুঝতে পারে দীর্ঘ ১০০ বছর ধরে ভারতীয়রা তাদেও কারণে যে বঞ্চনা ও বৈষম্যের শিকার হয়েছে, তাতে সাধারণ জনগণের মাঝে ইংরেজদের বিরুদ্ধে বড় ধরনের ক্ষোভ বিরাজ করছে। তাদের এই ক্ষোভ প্রশমিত করার জন্য তারা বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন ধরনের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান গড়ে তোলে। ধীরে ধীরে ভারতীয়রা শিক্ষাদীক্ষায় একটু উন্নতি লাভ করলে তারা বুঝতে পারে ইংরেজ শাসকরা কিভাবে এবং কত উপায়ে তাদের শোষণ করছে। তখন প্রথমে কংগ্রেস এই শোষণ ও শাসনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ শুরু করে। পাকিস্তানের প্রতিষ্ঠাতা জিন্নাহ বিলাত থেকে পড়া লেখা শেষ করে এসে প্রথমে কংগ্রেসে যোগ দেন; কিন্তু তাদের সঙ্গে বনিবনা না হওয়ায় ঢাকায় প্রতিষ্ঠিত মুসলিম লীগের মতো একটি অরাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানকে অনেকটা ছিনতাই করে তাকে একটি রাজনৈতিক প্লাটফরমে রূপান্তর করেন।

জিন্নাহ অত্যন্ত চালাক ও ধূর্ত ছিলেন। আর ছিলেন চরম ক্ষমতালোভী। ভারত ভেঙে পাকিস্তান সৃষ্টি হলে তিনি একাধারে পাকিস্তানের বড়লাট ও সংসদের প্রেসিডেন্ট (স্পিকার) হয়েছিলেন। খুব করুণ অবস্থায় জিন্নাহর মৃত্যু হয়েছিল। তাঁর শেষ দিনগুলো জানতে হলে পড়তে হবে তাঁর বোন ফাতেমা জিন্নাহর লেখা জিন্নাহর জীবনী ‘মাই ব্রাদার’। পাকিস্তানের প্রথম প্রধানমন্ত্রী লিয়াকত আলী খানের মুসলমানদের জন্য পৃথক আবাস ভূমি চাওয়ার অন্যতম কারণ ছিল তাঁদের বিশাল পারিবারিক জমিদারি রক্ষা করা। এই জমিদারি পাঞ্জাব পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল।

বাংলার মুসলমানরা এই পাকিস্তান আন্দোলনে সম্পৃক্ত হয়েছিলেন এটি চিন্ত করে, নিজেদের জন্য একটি পৃথক আবাস ভূমি হলে তাঁদের আর্থ-সামাজিক অবস্থার কিছুটা উন্নতি হবে। পলাশীর যুদ্ধের পর বাঙালি মুসলমানরা শিক্ষাদীক্ষাসহ সব কিছুতেই পিছিয়ে পড়েছিল। বেশির ভাগ ক্ষেত্রে কৃষি ভূমির মালিক ছিল হিন্দু জোতদার জমিদার, মহাজনরা। বেশির ভাগ মুসলমান তাদের জমিতে বর্গাচাষ করত। নিজেদের জন্য একটি স্বাধীন আবাস ভূমির স্বপ্ন দেখে তারা নিজেদের ভাগ্যোন্নয়নের স্বপ্ন দেখেছিল।

১৯৪৭ সালে ভারত ভাগ হয়ে পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তান সৃষ্টি হলে তারা দেখেছিল তাদের সেই স্বপ্ন ছিল ভ্রান্ত আর অনেকটা কল্পনা বিলাস। মুসলমানদের জন্য যখন পৃথক আবাস ভূমি নিয়ে ইংরেজ শাসকদের সঙ্গে জিন্নাহ দেনদরবার করছেন, তখন ১৯৪০ সালের লাহোর মুসলিম লীগের সম্মেলনে প্রস্তাব উত্থাপিত হয় যে উপমহাদেশে যেসব প্রদেশে মুসলমানরা সংখ্যাগরিষ্ঠ ছিল, প্রতিটি পৃথক রাষ্ট্র হবে এবং পরবর্তীকালে প্রয়োজনে কনফেডারেশনও করতে পারে। বর্তমান পাকিস্তানের কোনো প্রদেশই তখন মুসলমান সংখ্যাগরিষ্ঠ প্রদেশ ছিল না একমাত্র অবিভক্ত বাংলা ছাড়া। জিন্নাহর এক প্রতারণার মাধ্যমে ১৯৪৬ সালে দিল্লিতে মুসলিম লীগের এক বিশেষ কাউন্সিল সভায় লাহোর প্রস্তাবকে পরিবর্তন করে মুসলমানদের জন্য একাধিক নয়, একটি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব করে, যার

-২-

ফলে পূর্ববঙ্গ পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত হওয়ার সুযোগ সৃষ্টি হয় । অথচ কলকাতায় যেসব মুসলমান বাঙালি একাধিক পৃথক আবাস ভূমির জন্য আন্দোলন করছিলেন (তরুণ শেখ মুজিব তখন রাজপথের একজন কর্মী) তাঁদের ধারণা ছিল অবিভক্ত বঙ্গ পৃথক স্বাধীন রাষ্ট্র হবে, কারণ তখন সমগ্র ভারতবর্ষে এই বঙ্গই একমাত্র মুসলমান সংখ্যাগরিষ্ঠ প্রদেশ ছিল। বাংলার মুসলিম লীগ নেতারা মেনে নিলেন, কারণ তাঁদের ধারণা, স্বাধীন হলে বদলে যাবে তাঁদের ভাগ্য। তখন বঙ্গের প্রধানমন্ত্রী (মুখ্যমন্ত্রী) ছিলেন হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী, যিনি পরবর্তীকালে আওয়ামী লীগের সভাপতি হয়েছিলেন (ভারপ্রাপ্ত)। কিছুদিনের জন্য পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রীও।

পাকিস্তানের বাঙালি মুসলমানদের মোহ ভাঙতে বেশিদিন সময় লাগেনি। ১৯৪৮ সালের মার্চ মাসে জিন্নাহ ঢাকা এসে রমনা রেসকোর্স ময়দানে এক জনসভায় ইংরেজিতে ঘোষণা করলেন, পাকিস্তানের ৬ শতাংশ মানুষের ভাষা, যারা মূলত উত্তর প্রদেশ ও বিহার থেকে পাকিস্তানে মোহাজের হিসেবে এসেছে তাদের ভাষা উর্দুই হবে পাকিস্তানের একমাত্র রাষ্ট্রভাষা, যার অর্থ হচ্ছে রাতারাতি বাকি ৯৪ শতাংশ মানুষ সরকারি সব কাজকর্ম থেকে বঞ্চিত হয়ে গেল। এর প্রথম প্রতিবাদ সেই জনসভায়ই হয়। একই দিন সন্ধ্যায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কার্জন হলে জিন্নাহর সংবর্ধনা সভায় তিনি আবারও একই কথা বলেন। এবার উপস্থিত ছাত্ররাই, যাঁর মধ্যে তরুণ শেখ মুজিবও ছিলেন জিন্নাহর এই বক্তব্যে প্রতিবাদ করেন। বস্তুতপক্ষে ১৯৪৮ সালেই শুরু হয় বাঙালির জাতীয় মুক্তির আন্দোলনের সূত্রপাত। আন্দোলন করতে চাই সংগঠন। শেখ মুজিব অন্য ছাত্রনেতাদের নিয়ে গঠন করলেন পূর্ব পাকিস্তান মুসলিম ছাত্রলীগ। ছাত্রদের সংগঠন নিয়ে কোনো রাষ্ট্রীয় আন্দোলন বেশি দূর নিয়ে যাওয়া কঠিন মনে হয়েছিল তরুণ ছাত্রনেতাদের। ১৯৪৯ সালের ২৩ জুন জন্ম হয় পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী মুসলিম লীগ। এর পেছনে সবচেয়ে বড় অবদান ছিল শেখ মুজিবের। সভাপতি মওলানা ভাসানী, আর সাধারণ সম্পাদক শামসুল হক। যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক শেখ মুজিব। শুরু থেকেই আওয়ামী লীগের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য ছিল পূর্ব বাংলার মানুষের অধিকার আদায় ও সেই লক্ষ্যে পাকিস্তানের এই অংশসহ প্রতিটি প্রদেশের স্বায়ত্তশাসন।

১৯৪৯ সালে প্রতিষ্ঠিত এই দলটি এ বছর ৭১তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী পালন করবে এক ভিন্ন পরিস্থিতিতে। এ বছর জাতির জনক বঙ্গবন্ধুর জন্ম শতবর্ষ। অনেক বড় ধরনের বছরব্যাপী অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছিল। সব কিছু এখন অনেকটা তোলা আছে। কিন্তু প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী তো আর তোলা থাকতে পারে না। এই ৭১ বছরে এই দলটি হাজারো প্রতিকূলতার মাঝেও যা অর্জন করেছে তা এই উপমহাদেশের অন্য কোনো রাজনৈতিক দল অর্জন করতে পারেনি। ভেঙেছেও একাধিকবার। নিষিদ্ধ হয়েছে অন্তত ছয়বার। ১৯৫৪, ১৯৫৬ বা ১৯৭০ নির্বাচনের প্রদেশ কিংবা কেন্দ্রে জয়লাভ করেও পাকিস্তানের সামরিক-বেসামরিক আমলাদের ষড়যন্ত্রের কারণে ক্ষমতায় যেতে পারেনি। ১৯৫২ সালে রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনে অনেকের সঙ্গে ছাত্রলীগ ও আওয়ামী লীগের নেতাকর্মীরা রাজপথে বুকের রক্ত দিয়েছেন। ১৯৭১ সালে এই দলটির নেতৃত্বে বাঙালি নিজের মাতৃভূমি স্বাধীন করার জন্য যুদ্ধে গিয়েছিল। এই দলই জাতিকে উপহার দিয়েছিল হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। বঙ্গবন্ধুর অন্যতম বড় কীর্তি ১৯৬৬ সালে বাঙালির মুক্তির সনদ ছয় দফা ঘোষণা, যার ভিত্তিতে ১৯৭০-এর নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছিল।

আওয়ামী লীগ যখনই নির্বাচনে বিজয় লাভ করেছে তখনই মানুষ কিছু পেয়েছে। ১৯৭০-এর নির্বাচনের পর বাঙালি একটি স্বাধীন দেশ পেয়েছে। কিন্তু সেই স্বাধীন দেশে বঙ্গবন্ধু বেঁচে ছিলেন সাড়ে তিন বছর। ১৯৭৫ সালের ১৫ই আগস্ট পাকিস্তানের প্রেতাত্মারা বঙ্গবন্ধু ও তাঁর পুরো পরিবারকে অত্যন্ত নৃশংসভাবে হত্যা করে। বেঁচে যান বিদেশে থাকা তাঁর দুই কন্যা আজকের ক্রান্তিকালের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ও ছোট বোন শেখ রেহানা। দীর্ঘ ২১ বছর পর বঙ্গবন্ধুর জ্যেষ্ঠ কন্যা শেখ হাসিনা একটি নির্বাচনের মাধ্যমে দলটিকে আবার ক্ষমতায় ফিরিয়ে এনেছিলেন। প্রতিষ্ঠার পর থেকে আওয়ামী লীগের অর্জন আছে অজস্র। কিন্তু অনেক সময় কাছের মানুষরাই অনেক কিছু পণ্ড করে দিয়েছেন। আশা করব ৭১তম জন্ম বার্ষিকীতে বঙ্গবন্ধুকন্যা সব প্রতিকূল পরিস্থিতি মোকাবেলা করে দেশকে আরো উন্নত শিখরে নিয়ে যাবেন। এই দিনে জাতির জনক বঙ্গবন্ধুর স্মৃতির প্রতি গভীর শ্রদ্ধা ও আওয়ামী লীগের প্রয়াত নেতাকর্মীদের প্রতি অভিবাদন। বঙ্গবন্ধুকন্যা শেখ হাসিনা ও শেখ রেহানার প্রতি রইল ভালোবাসা। বাংলা ও বাঙালির ইতিহাসে বাংলাদেশ, বঙ্গবন্ধু ও তাঁর কন্যা শেখ হাসিনা এক বিস্ময়কর স্থানে নিজেদের জন্য জায়গা করে নিয়েছেন। সেই স্থানটুকু তাঁদের জন্য নির্ধারিত যেমন ভাবে অনিবার্য ছিল আওয়ামী লীগের জন্ম।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু।

বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

#

লেখক : আবদুল মান্নান, সাবেক চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন

২১.০৬.২০২০ পিআইডি নিবন্ধ